উচ্ছ্বাস পঞ্চক।



শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী।

প্রণীত ও প্রকাশিত।

৭৭।১ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"



কলিকাতা, ১১১।৪এ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,

কোহিনুর প্রিন্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮৪১।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

উচ্ছ্বাস পঞ্চক

ওঁ

নমো শ্রীকৃষ্ণায়।

ভুমিকা।

চিরজীবন হৃদয়কন্দরে যাহা ধ্বনিত হইতেছিল তাহা উচ্ছ্বাস পঞ্চকে কিয়ন্মাত্রায় স্ফুরিত হইল। ঐ ধ্বনি হৃদয়ে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। কোথায় সেই সনাতন সর্ব্বতোবিশারী মাধুর্য্য তরঙ্গ, আর কোথায় এই কর্ণজ্বরোৎপাদক ছিন্ন ভিন্ন কুতন্ত্রী ঝঙ্কার! পাঠক, নিতান্ত উদ্বেজিত না হন তাহা হইলেই অযোগ্য গ্রন্থকার চরিতার্থ।

আমার পরম বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, মহাশয় সাহস না দিলে উচ্ছ্বাস পঞ্চক প্রচারে অগ্রসর হইতাম না। তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ইহা প্রচার করিলাম। কিমধিকমিতি।

৭৭।১ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শকাব্দাঃ ১৮৪১।

শ্রীজ্ঞানানন্দ শর্ম্মা



শ্রীরবীন্দ্রশর্ম্মণঃ

উৎসর্গ-পত্র।

পরমারাধ্য স্বর্গীয় তাতপাদেষু—

দেব!

শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা জীব ধর্ম্ম। মায়াবদ্ধ সকল জীবই মায়া কাটাইবার জন্য জ্ঞানে বা অজ্ঞানে চেষ্টা করিতেছে, সাধনা করিতেছে। লক্ষ লক্ষ জন্মান্তরে মানবদেহ ধারণ করিয়াছি। এখন বাসনা আরও উৎকৃষ্ট দেহ অবলম্বন করি। তাই সামর্থ্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ওঁকার মন্ত্র বিষয়ক চিন্তা, তাই উচ্ছ্বাস পঞ্চকের সৃষ্টি। এ হেন পুস্তক পিতৃদেব! আপনি যেখানে থাকুন, আপনার উদ্দেশে নিবেদন করিলাম। প্রার্থনা করি গ্রহণ করিবেন, ইতি।—

শ্রীজ্ঞানানন্দ শর্ম্মা।

উচ্ছ্বাস পঞ্চক

প্রথম উচ্ছ্বাস

বিশ্বসমস্যা

নন্দদুলালের বয়ঃক্রম সাত বৎসর। বিদ্যালয়ে নূতন যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহার যাহা দেখে, তাহার তাহা লইতে চায়, যাহার মুখে যাহা শুনে, তাহাই শিখে। একদিবস বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে বাটীতে আসিয়া পিতার নিকট কতকগুলি দ্রব্য কিনিবার জন্য আবদার করিল। পিতার তাদৃশ সচ্ছল অবস্থা নহে, সুতরাং পিতা, পুত্রের প্রার্থিত দ্রব্যগুলি আনিয়া দিতে পারিলেন না। ইহাতে নন্দদুলালের বিরক্তির সীমা রহিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ফেলিল, "বাবার যদি টিকি থাকিত তাহা হইলে আমি উহা ধরিয়া জোরে টানিতাম।"—নন্দদুলাল বিদ্যালয়ের কোন বালককে তাহার সহপাঠীর টিকি টানিতে দেখিয়াছিল, সুতরাং পিতার প্রতি তাহার তদ্রূপ আচরণের ইচ্ছা হইয়াছিল।

অবোধ পুত্রের পিতাও অবোধ। পিতা অনন্যমনে চিন্তা করেন, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেন, আপনার অল্প বুদ্ধি ভাবিয়া

ধিক্কার দেন, আর পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া ভাবেন, যদি এ বিশ্বের আদিদেবকে দেখিতে পাইতাম তাঁহার টিকিতে টান দিয়া বলিতাম, নারায়ণ! তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে ও তোমায় ধরিবার পথ বাহির করিতে এত কষ্ট কেন? এত তর্ক বিতর্কই বা কেন? তুমি দয়াময়! কৃপা করিয়া জীবের মুক্তি বিধানের জন্য, তোমার সৃষ্টি রহস্য বুঝিবার ও তোমায় ধরিবার একটী সুগম পথ বাহির করিয়া দাও না কেন?

গ্রামের অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষমূলে প্রস্তরখণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে। সহস্র সহস্র লোকে নতশিরে সেই প্রস্তর খণ্ডকে প্রণাম করিয়া থাকে। সেই ষষ্ঠীদেবীর যাঁহার প্রতি কৃপা হয়, যিনি ষষ্ঠীদেবীকে ভক্তিসহকারে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যসহ পূজা করেন, তাঁহারই গৃহে পুত্র-কন্যা শোভিত, আর যিনি দেবীকে অবজ্ঞা করেন, তাঁহার বংশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ষষ্ঠীদেবীকে উত্তম নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেই কি বংশ বৃদ্ধি হয়? অবোধ পুত্রের পিতা বুঝিতে অক্ষম। পুরোহিত মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা, পরিচ্ছদাদি দান করা হয় না, তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করেন না। গৃহে কোন অকল্যাণ ঘটিলে পিতা ভাবেন, পুরোহিত মহাশয়ের অসন্তোষ কি তাঁহার গৃহে অকল্যাণের কারণ? কোন পুত্রের পীড়া হইল চিকিৎসক মহাশয় বলিলেন পুত্রের শোণিত বিষাক্ত হইয়াছে, ঔষধের দ্বারা বিষ নষ্ট করিবার প্রয়োজন। পিতা ভাবিলেন, বালকের প্রাণনাশের জন্য কি নারায়ণ বিষের সৃষ্টি করিয়াছেন? দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আসিলেন, বালকের জন্মপত্রিকা বিচারে বলিলেন, শনির কুদৃষ্টি হেতু বাল-

কের পীড়া হইয়াছে, শনিগ্রহের শান্তি করা প্রয়োজন। পিতা ভাবিলেন শনির কুদৃষ্টিই কি বালকের রোগের কারণ? মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশীগণ বলিলেন, গ্রামের বৃদ্ধা ডাইন বালককে কুদৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই বালকের রোগের কারণ। রোজার দ্বারা ঝাড়াইলে বালকের রোগ শান্তি হইবে। পিতা ভাবিলেন, ডাইনের কুদৃষ্টিই কি বালকের রোগের কারণ? কতিপয় বন্ধু বলিলেন, বাসের বাটীটি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, বাটী পরিবর্ত্তন করিলেই বিনা ঔষধে রোগ উপশম হইবে। পিতা ভাবিলেন, পুরুষানুক্রমের বাস্তবাটী ত্যাগ করিলেই কি রোগ উপশম হইবে? বালকের মাতা বলিলেন, অন্নপ্রাশনের দিবস ছেলেটিকে স্বর্ণের অলঙ্কার দেওয়া হয় নাই, স্বর্ণের সংস্পর্শে সকল রোগ আরোগ্য হয়। যদি অন্নপ্রাশনের সময় হইতে বালক স্বর্ণ ব্যবহার করিত, তাহা হইলে কখনই বালকের এমন রোগ হইত না। পিতা ভাবিলেন, গৃহিণীর কথা কি বেদবাক্য নহে? অর্থাভাব কি বালকের রোগের কারণ? একজন দার্শনিক পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, গীতা গ্রন্থে কর্ম্মের প্রাধান্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন, বালকের এজন্মে কোন পাপ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং জন্মান্তরের কর্ম্মফলে বালক রোগে কষ্ট পাইতেছে। পিতা ভাবিলেন, জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলই কি বালকের রোগের কারণ?

অবোধ পিতা কিছুই স্থির করিতে পারেন না। নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করেন, সেখানে মহা তেজস্বী সূর্য্য, কিরণজালে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া জগতকে পবিত্র করিতেছেন। মল, মূত্র, পূতিগন্ধ, কিছুই সূর্য্যের ত্যাজ্য পদার্থ নহে। এই পবিত্রীকরণ

শক্তি কি দেবশক্তি? সূর্য্য কি দেবতা বিশেষ? না সূর্য্য সর্ব্বশক্তিমানের একখানি বিচিত্র অশ্বচালিত রথ? রথে আরোহণ করিয়া সেই আদিদেব পৃথিবীর চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া পাপী ও পুণ্যবানের কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন? অথবা সূর্য্য কেবল নানাবিধ বাষ্পে পরিবেষ্টিত গলিত ও প্রজ্বলিত লৌহাদি ধাতুর সমুদ্র-বিশেষ? আর সেই ধাতুরাশি কতশত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত নক্ষত্র পরিবেষ্টিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট গতিতে যথানিয়মে সমস্ত অনুচরবর্গের সহিত অবিরামে ধাবিত হইয়া সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে চালিত করিতেছে? কতপ্রকার ধাতুতে সূর্য্যদেহ গঠিত, মহামহোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিকগণ নানা যন্ত্রের সাহায্যে এখন স্থির করিতে পারেন নাই। মানব শক্তির চরম বিকাশেও তাহা আবিষ্কৃত হইবে কি না বলা দুঃসাধ্য। সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই একই ভাব হৃদয়ে জাগরূক হইবে। চারিদিকে বিস্তৃত অনন্ত আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে অবোধ পিতার কেন, কতশত যোগী-ঋষির বুদ্ধিভ্রংশ হয়। অনন্তব্যাপী আকাশ সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম রাশি রাশি পরমাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজিত এবং রাশি রাশি পরমাণু সর্ব্বত্র আলোক ও উত্তাপ সঞ্চালিত করিয়া সূর্য্যাগ্নির সমিধ-স্বরূপ হইতেছে, এই চিন্তা করিলে, কোন্ মানবের জ্ঞান বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়? এদিকে পরমাণুগুলি এক অদ্ভুত আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির বলে কত প্রকার অবয়ব ধারণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি এমন নিয়মের বশীভূত যে, কদাচ তাহার বৈলক্ষণ্য

হয় না। সকল পদার্থেরই উপযোগিতা আছে, সকল পদার্থেরই সার্থকতা আছে। অভ্রান্ত নিয়ম, অভ্রান্ত সার্থকতা, অভ্রান্ত উপযোগিতা। গ্যালেলিও, কোপরনিকস, বরাহমিহির, আর্য্যভট্ট, নিউটন, কেপলার, লাপলাস্ প্রভৃতি মহাশক্তিশালী বৈজ্ঞানিকগণ অদ্য এক নিয়ম আবিষ্কার করিলেন, কল্য সে নিয়ম ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। অবোধ পিতা কি বুঝিবেন! কাজেই অবোধ পিতার স্বতন্ত্র চিন্তা আসিয়া পড়ে।

অবোধ পিতা জীব-জীবনের প্রতি লক্ষ করিয়া দেখেন, একে অপরকে গ্রাস করিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, প্রভৃতি পশুগণ অপর জীবদেহ উদরস্থ করিয়া স্বস্বদেহ বৃদ্ধি করিতেছে। পক্ষিগণ, পতঙ্গদেহ গ্রাসে অভ্যস্ত। মশক, ছারপোকা, প্রভৃতি কীটগণ মনুষ্য-শোণিতপানে তৎপর। শাখামৃগ প্রভৃতি জন্তুগণ সজীব বৃক্ষলতাদি অকাতরে ভক্ষণ করে। আর মানবের ত্যজ্য ও অভক্ষ্য কিছুই নাই; বৃক্ষলতাদি হইতে আরম্ভ করিয়া জলজ, স্থলজ সকল জীবকে উদরে স্থান দিয়া বিশ্বরাজ্যের সিংহাসনে আসীন। মানব, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব। এই জন্য কেবল স্বয়ং জীব-শোণিতপানে তৃপ্ত হন না। মাতৃক্রোড় হইতে বৎসকে কাড়িয়া লইয়া কল্পনাসম্ভূত দেবদেবীর তৃপ্তিকল্পে জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার শোণিত সোপচারে উৎসর্গ করিয়া তাহাকে মুক্তিদান করেন।

রামের ধন, শ্যাম অপহরণ করিতেছে, আবার শ্যামের ধন, মাধব কাড়িয়া লইতেছে। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বলবান,

নির্ভীক, সহস্রগুণান্বিত রামচন্দ্র, পতিব্রতা বিমাতা কৈকেয়ীর প্রার্থনায় বনবাসী হইলেন। তথায় পতিপরায়ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতাদেবীকে বলবান রাক্ষস রাবণ ছলে ও বলে অপহরণ করিলেন। প্রাণান্ত শ্রম করিয়া বন্ধুগণের সহায়তায় সীতা উদ্ধার হইল। উদ্ধারেও নিষ্কৃতি নাই, রাবণগৃহে বহুকাল একাকী বাসের জন্য অপবাদ ঘোষিত হইল। সীতার সতীত্ব সম্বন্ধে প্রজাগণের সন্দেহ জন্মাইল। আজন্ম দুঃখভোগ করিয়া সীতা দেহত্যাগ করিলেন। আজন্মশুদ্ধা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতার কি জন্য এত দুঃখভোগ? কেহ বলিলেন, লোক-শিক্ষার্থ সীতার জন্ম; কেহ বলিলেন, দেবতার অভিসম্পাতে সীতার কষ্ট; কেহ বলিলেন, জন্মান্তরের পাপের ফলে সীতা জন্ম-দুঃখিনী। ফলতঃ যখন ইহজন্মে সীতার পাপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন জন্মান্তরে অবশ্য সীতার পাপ সঞ্চয় হইয়া থাকিবে। ইহজন্মের পূর্ব্বে যে জন্ম ছিল, তাহাই জন্মান্তর। তাহার পূর্ব্বে যে জন্ম ছিল তাহা কি নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল? না তাহা নয়। তাহার পূর্ব্বে আরও জন্ম ছিল, আবার তাহার পূর্ব্বে ও জন্ম হইয়াছিল। এই প্রকার অনন্তকাল হইতে জন্মের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। জন্মজন্মান্তের কথা স্মরণ নাই কেন? স্মরণ শক্তি যে যন্ত্রের বা বস্তুসমষ্টির সাহায্যে উদিত হয়, জীবাত্মা দেহকে ত্যাগ করিলে সেই বস্তুসমষ্টির ধ্বংস হয়, সুতরাং জন্ম জন্মান্তরের কথা স্মরণ থাকে না, কিন্তু জন্মান্তর আছে, ইহা সত্য। তবে সীতার জন্মান্তরের পাপ কোথা হইতে আসিল? বহুপূর্ব্ব হইতে। কত পূর্ব্ব হইতে কেহ বলিতে পারেন না, সুতরাং বলিতে

হইবে অনন্তকাল হইতে। ভাল, যদি সীতার পাপ অনন্তকাল হইতে সীতার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তবে সীতা আজ কেমন করিয়া সেই পাপকে ত্যাগ করিবে? অনন্তকে কল্পনায় আনা যায় না। সীমাবদ্ধ জীবের, নিতান্ত পক্ষে অবোধ পিতার—অনন্তকে কল্পনায় আনা অসম্ভব।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিল। স্বয়ং বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহায়। বাসুদেব সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি যে পক্ষের সহায় সে পক্ষের কি পরাজয় সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সহায় কেন? পাণ্ডবগণ ধার্ম্মিক, আর যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণ। দুর্য্যোধন অধার্ম্মিক, দুর্য্যোধনের পরাজয় অনিবার্য্য। ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথিগণ সহায় হইলেও পাপের পরাভব সংসারের নিয়ম। ধর্ম্মের গ্লানি নারায়ণ সহ্য করিতে না পারিয়া কুরুপাণ্ডবের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়াছিলেন। কোটী কোটী অশ্ব, গজ, উষ্ট্রাদি নিধন প্রাপ্ত হইল। দুর্য্যোধন অত্যাচারী, তাঁহার পুত্রেরা, অনুচরবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি পুত্রপৌত্রগণের সহিত অত্যাচারী, তাহাদের বাহনগুলিও অত্যাচারী; তাহাদের সকলের বিনাশসাধন নারায়ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এইজন্য বাসুদেবরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া পুণ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরপক্ষীয় বহুসৈন্যসামন্ত, আত্মীয়স্বজন, অশ্বগজাদির সহিত ধর্ম্ম-পক্ষাবলম্বন করিয়াও কেন অকালে যমপুরীতে পৌছিলেন? মৃত্যুর আবার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ কি? কল্য মরিত, না হয় অদ্য মরিল। কালকে অনন্ত ধরিলে দুইমাস, দুই বৎসর অগ্রপশ্চাৎ

কিছুই নহে। ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলেই হইল। ভাল, ধর্ম্মের বৃদ্ধি হউক, সকলে রসাতলে যাউক, ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু এমন সর্ব্বসংহারক অধর্ম্মের সৃষ্টির প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে, অধর্ম্ম না থাকিলে ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি হয় না। এক শ্রীকৃষ্ণ, এক বাসুদেব এক নারায়ণইত সব। সেই নারায়ণের নামে যদি ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি না হয়, অধর্ম্মের সৃষ্টিতে কি ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি হইতে পারে? নিত্যশুদ্ধ পরমাত্মা, পাপের সহিত জড়িত কেন হইলেন? জগতে লীলা দেখাইবার জন্য। অবোধ পিতার লীলাতত্ত্ব বুঝিতে মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া পড়িল।

অবোধ পিতা ভাবেন সেদিন মাতৃক্রোড়ে ছিলাম, পরে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম। বিবাহ হইলে সন্তানসন্ততি লইয়া ঘোর সংসারী, ক্রমে বৃদ্ধ, দুইদিন পরে কোথায় যাইব স্থির নাই। দেহস্থিত যাহাকে জীবাত্মা বলে, তাহার কোথায় গতি হইবে নিশ্চয় বুদ্ধিতে বুঝিবার উপায় নাই। স্থূল দেহটী ভস্মীভূত হইবে। অগ্নির সংস্পর্শে কতক অঙ্গারে, কতক ধূমে বা বাষ্পে পরিণত হইবে। অঙ্গারগুলির শেষ দৃশ্যমান পরিণতি মৃত্তিকা। বাষ্প আকাশে উড়িয়া যাইবে। রাশি রাশি বাষ্পের সহিত মিশিয়া যাইবে। আমার দেহের বাষ্প রামের দেহের বাষ্পের সহিত একত্র হইয়া যাইবে, আবার রামের দেহের বাষ্প শ্যামের দেহের বাষ্পের সহিত মিলিত হইবে। অঙ্গার গুলিরও সেই পরিণতি। ফলে যাহাকে প্রাণ বলা যায়, তাহা দেহ হইতে চলিয়া গেলে, রামের, তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ দেহের শ্যামের কদর্য্য দেহের সহিত প্রভেদ থাকিবে না। বাষ্প, বৃষ্টিতে পরিণত

হইতে পারে, বৃষ্টি, মৃত্তিকা-সংযোগে লতা বৃক্ষাদি উৎপন্ন করে, বৃক্ষলতাদিতে ফলশস্য উৎপন্ন হয়, ফলশস্য আহারে জীবদেহ বর্দ্ধিত হয়, জীবদেহে সন্তান উৎপন্ন হয়। বৃক্ষাদির বীজ, ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতির সমষ্টি, আর যাহাকে প্রাণ বলা যায়, তাহা এক অলক্ষিত তেজ। তাহা কল্পনায় আনা দুঃসাধ্য। রামের ভৌতিক দেহ যখন শ্যামের ভৌতিক দেহের সহিত মিলিত হইতে পারে, রামের সূক্ষ্মদেহ বা প্রাণ কি তদবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না? কেহ বলেন, এই রামশ্যামের ক্ষয় নাই। অনন্তকাল পর্য্যন্ত রামশ্যাম ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিদ্যমান থাকিবে। প্রলয়কালে যখন সমস্ত বিশ্বজগৎ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইবে, রামশ্যামও সঙ্কুচিত হইবে এবং পুনঃসৃষ্টিকালে, পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে ও কর্ম্মফলভাগী হইবে। এই প্রকার সঙ্কোচ ও বিকাশ কার্য্য চলিতে থাকিবে। অবশেষে রামশ্যাম, মুক্তি পাইবে। কেহ বলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে, রামশ্যামের কোন পার্থক্য নাই। রাম যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, আর শ্যাম যে পর্ণশালায় বাস করিতেছে, ফল সমানই। ধনবান ও দুঃখী সকলই সমান। সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়, কেবল রামশ্যামকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখাইতেছে মাত্র। রামও অপ্রকৃত, শ্যামও অপ্রকৃত। অদ্য রাম সুন্দর, কল্য সে কদাকার; অদ্য তুমি যুবা, কল্য তুমি বৃদ্ধ; অদ্য তুমি ধনী কল্য তুমি দুঃখী; জগতে এই পরিবর্ত্তন অবিরামে চলিতেছে। এক্ষণে বাষ্প, পরক্ষণে বৃষ্টি ও তৎপরে শস্যাদি। বাষ্পের, জলের, স্থলের, শস্যের পরমাণু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত

করিতে পারিলে প্রমাণিত হইতে পারে, সকল সামগ্রীর পরমাণু একই পদার্থ। এ সমন্ধে নানাদেশে নানা মতভেদ আছে। অবোধ পিতা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, মনের ক্ষোভে যদি তাহার বিশ্বস্রষ্টার প্রতি ক্ষণৈক বিরক্তি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে, বোধ হয় সে অপরাধ ক্ষমার্হ।

কেহ কেহ বলেন বস্তু ও চৈতন্য একই পদার্থ। চৈতন্যের দৃশ্যমান অবস্থাই পদার্থ। বিজ্ঞানের সাহায্যে কত কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। যাহা কিছু জগতে বিদ্যমান আছে, অথচ যাহা সাধারণের অজ্ঞাত তাহাই বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইতে পারে; কিন্তু যে মহাশক্তি এই সমস্ত বিদ্যমান পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কি বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকাশ্য? বিজ্ঞানবিদ্ নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, আকাশকে মধ্যে না রাখিলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অনুমান করা যায় না। নিউটনের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন পুরুষ কালে কালে প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন, কিন্তু মহতত্ত্বগুলির কর্ত্তাকে উপলব্ধি করা কি বিজ্ঞানের কার্য্য? কাল, পরমাণু, আকাশ, চৈতন্য প্রভৃতিকে কে সৃষ্টি করিল? ইহা কি যন্ত্রের সাহায্যে স্থির করা যায়? চিন্তায় কি ভগবানকে আনা যায়? যে মহাশক্তি বস্তুনিচয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, অবিরাম গতি, আকার পরিবর্ত্তন ও পুনঃ-সংগঠন জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা কি? যে মহাশক্তি, যে আদিদেব, যে অনির্ব্বচনীয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন, যিনি ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভক্তি-অভক্তি, ভাব-অভাব প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি অতি

সূক্ষ্ম পরমাণুকে অভ্রান্ত নিয়মে চালিত করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি? যে সাধনাবস্থায় তর্কের বা চিন্তার শক্তি থাকে না, যে অবস্থায় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, যে অবস্থায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ, শোক-তাপ, নিন্দা-স্তুতি, আত্ম-পর জ্ঞান থাকে না, যে অবস্থায় আপন অস্তিত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, সেই এক অপূর্ব্ব অবস্থাতেই সেই বিশ্বস্রষ্টার শক্তি বা বিশ্বস্রষ্টাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সাধনা বলেও ভগবৎ-কৃপায়, সেই চরম অবস্থায় পৌছিতে পারিলে, সকল জীবের হৃদয়ে এমন এক শক্তি লুক্কায়িত ভাবে আছে, তাহা স্বতঃই জাগরূক হইয়া হৃদয় মধ্যে নারায়ণে একান্ত বিশ্বাস আনিয়া দেয়। তাহাই শ্রদ্ধা, তাহাই ভক্তি; সে সময়ে আর আদিদেবের টিকিতে টান দিতে ইচ্ছা হয় না, বরং জীবে তাঁহার অপার কৃপা উপলব্ধি হয়। তাহাই বোধ হয়, ঋষিগণের কল্পিত অপূর্ব্ব সোঽহং অবস্থার পূর্ব্বভাব। দেশদেশান্তর উচ্চনিম্নভূমি পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর মহাসাগরে পতনোন্মুখ হইবার পূর্ব্বে তাহার যাদৃশ অবস্থা হয়, মানবের পক্ষে সে অবস্থাও তাদৃশ অবস্থা। পুরাকালে ধ্রুবের একদিন হয় ত সেই অবস্থা হইয়াছিল, যে দিন ধ্রুব মর্ম্মান্তিক মনস্তাপে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া হিংস্র জন্তুকে পর্য্যন্ত পদ্মপলাশলোচন জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন। সম্ভবতঃ সেই অবস্থা একদিন বৃন্দাবনের গোপীগণেরও হয়—যে দিন তাঁহারা তাঁহাদের স্তন্যপায়ী শিশুকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণকুঞ্জে অপার্থিব সুখ আস্বাদন করেন, আর যে দিন স্ত্রীসুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া পরপুরুষের নিকট বস্ত্রহীনা

হইয়াও লজ্জা পান নাই। সেই অবস্থাতেই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সকল শাস্ত্রবেত্তা অর্জ্জুন সকল শাস্ত্রজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া, অনন্ত, অতুলপ্রভাবসম্পন্ন, অসংখ্যবক্ত্র, অসংখ্য নয়ন ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময়-দেহযুক্ত, বিশ্বের যোনিস্বরূপ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া লোমাঞ্চিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করেন :—

"পশ্যামি দেবাংস্তবদেবদেহে,
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥"



দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

হিন্দুর সাধনা।

—— :০: ——

ইতঃপূর্ব্বে বিশ্বসমস্যা প্রসঙ্গে জীবের এক অপূর্ব্ব অবস্থার কথা ইঙ্গিত করিয়াছি। সাধনবলে সে অবস্থায় পৌছিতে পারিলে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সেই অপূর্ব্ব অবস্থা জাগরূক হইয়া হৃদয়মধ্যে মানবের নারায়ণে তদ্গতপ্রাণ করিয়া তুলে। সাধনা জীবের মুক্তি বিধানের সুগম বা দুর্গম একই পথ, সুতরাং জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বলাবাহুল্য প্রত্যেক বস্তুতে বিদ্যমান অলক্ষিত তাপশক্তি, অবস্থা-ভেদে প্রকাশ পায়। চন্দনকাষ্ঠ বাহ্য দৃষ্টিতে অতি স্নিগ্ধ, কিন্তু পরস্পরের ঘর্ষণে উহাতে অলক্ষিত ভাবে স্থিত দাহিকাশক্তি প্রকাশ পায়। বহুসামগ্রীতে অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান বৈদ্যুতিক পদার্থ কারণ ভেদে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। লৌহের চুম্বুক শক্তি অবস্থাবিশেষে প্রত্যক্ষীভূত হয়। মানব শরীরেও ঐরূপ। ঘাতক-গণ নিত্য সহস্র সহস্র প্রাণীহত্যা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিলেও অবস্থা বিশেষে তাহাদের হৃদয়ে একান্ত মমতার উদ্রেক হইতে দেখা যায়। আবার নিরতিশয় দয়াদ্র´চিত্ত মানবেরও কঠোর আচরণের

বৃত্তান্ত শ্রুতিগোচর হয়। যে মহাবীর নেপোলিয়ন, সমরক্ষেত্রে অম্লানবদনে মানবের শোণিতধারায় য়ুরোপের বহু নদনদীর বর্ণ বিবর্ণ করিয়াও ক্ষণেকের জন্য ক্ষুব্ধ হন নাই, সেই নেপোলিয়ন পাত্র ও অবস্থা বিশেষে পরদুঃখকাতরতার এমন পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মনে হয় যে, নেপোলিয়নের হৃদয়ে কঠোরতার লেশমাত্র ছিল না। যেমন দয়া, মমতা, স্নেহ, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ে ক্ষেত্রবিশেষে অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিয়া অবস্থাভেদে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরে একান্ত শ্রদ্ধা বা ভক্তি সকল হৃদয়ে অল্পাধিক অন্তর্নিহিত থাকিয়া জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত সেই শ্রদ্ধা সেই ভক্তি উৎকট সাধনাবলে উচ্ছলিত হইয়া পড়ে।

সুনীতি পুত্র, বিমাতা সুরুচির মর্ম্মান্তিক কঠোর বাক্য প্রয়োগে মর্ম্মবেদনা না পাইলেও ধর্ম্মপ্রাণা মাতার "সুশীলো ভবধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতেরতঃ" আদি বচনে উৎসাহিত না হইলে হয়ত বালকের কঠোর সাধনার চেষ্টা হইত না, নিতান্ত পক্ষে কিছু দিনের জন্য সে চেষ্টা হৃদয়ে অবরুদ্ধ থাকিত। গুরু যেমন স্বীয় তেজ শিষ্যে নিয়োগ করতঃ শিষ্যের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের বিকাশ করাইয়া দেন, স্বর্গাদপি গরীয়সী, গুরু অপেক্ষা পূজ্যা, শ্রদ্ধাস্পদা দেবীসদৃশী মাতা সুনীতির বাক্যে ধ্রুবের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি শুদ্ধি প্রাপ্তি হইয়া, ইহজন্মে সেই শুদ্ধবুদ্ধি সামান্য কারণে পরিস্ফুরণ হইয়াছিল এবং বালক পরমোৎসাহে মর্ম্মাহত মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন, "মাতঃ! আমার অন্তরে সেই স্থান পাইবার বাসনা জাগ্রত হইয়াছে, যে

স্থান আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।” বিমাতার হৃদয়স্পর্শী বাক্য বা রত্নগর্ভা মাতার উপদেশ উপলক্ষমাত্র, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুষ্ঠান বা সাধনাই মুখ্য কারণ। ধ্রুবের পূর্ব্বদেহাবসানে কর্ম্মফল সঙ্কুচিত অবস্থায় ছিল, সামান্য কারণে সেই কর্ম্মরাশির ফল সহসা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পড়িল—কাঠে কাঠে ঘর্ষণ হইয়া অগ্ন্যুৎপাদন হইল—ধ্রুব সর্ব্বদা অনুভূয়মান দুঃখকে মিথ্যাজ্ঞান করিয়া নিত্য সত্য পরম ব্রহ্মকে পাইবার বাসনায় রাজভবন ও একান্ত পুত্র বৎসলা মাতা সুনীতিকে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে ধাবিত হইলেন। অভ্যাসযোগে ধ্রুবের মানসিক ক্ষিপ্ত বা চঞ্চলাবস্থা, মূঢ় বা কামক্রোধাদির বশীভূতাবস্থা, ও বিক্ষিপ্ত বা সুখাস্বাদনাবস্থা দূরীভূত হইয়া পড়ে ও ক্রমে তাঁহার মন নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবিকম্পিত ভাবে পদ্মপলাশলোচনে নিবিষ্ট হয়। প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত তাপশক্তি, প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত বৈদ্যুতিকশক্তি, প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত চুম্বুকশক্তি, প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধ্রুবের দেহ, মন, বুদ্ধি ঐ ঐ শক্তিও গুণে পরিপূর্ণ হওয়ায় তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই নিত্যশুদ্ধ নারায়ণকে দেখিতে পান। সেই অবস্থাই হয়ত মহামুনি পতঞ্জলি কথিত নিরুদ্ধাবস্থা। সে অবস্থা কল্পনায় আনা দুঃসাধ্য। ফলে সে যাদৃশাবস্থাই হউক, সেই অবস্থা প্রাপ্তিই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী-গণের প্রার্থিতাবস্থা। ক্রমিক অভ্যাস ও সাধনার দ্বারা সেই অবস্থা-প্রাপ্তি আর্য্যধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঋষিগণের উপদিষ্ট গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ডের ধারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, পুরাকালে ঋষিগণ বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে উঠিয়াও বৈজ্ঞানিক

জ্ঞান, স্থূলজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের আনুষঙ্গিক জ্ঞান বলিয়া মনে করিতেন। মুক্তিলাভ যে, জ্ঞানের মূলমন্ত্র নহে, সে জ্ঞানের এ দেশে কখন বিশেষ সমাদর হয় নাই। যে জ্ঞানের বলে বলীয়ান হইলে ধ্রুবের ন্যায় পদ্মপলাশলোচনকে হৃদয়ের সিংহাসনে স্থান দিতে পারা যায়, সেই একান্ত ভক্তিমূলক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য ঋষিগণ এককালে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে কৈবল্য প্রাপ্তি হয় না। আর বাক্-বিতণ্ডা? তাহাদের সমাধিক্ষেত্রেই সাধনামন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা। সেইজন্য কেহ বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া"; কেহ বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা নতাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" দার্শনিকগণ বাদবিতণ্ডায় নিত্যশুদ্ধ প্রেমবৎসল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান না। জাগতিক সকল পদার্থের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়, সুতরাং চরম সত্যের সাক্ষাৎ লাভ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বহু আলোচনার পর পুরাকালে এই ভারতক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, যেখানে বাদবিতণ্ডার সমাপ্ত সেই-খানেই ধর্ম্মের অবতারণা—সেইখানেই কৃষ্ণপ্রেমের সূত্রপাত, সেইখানেই পদ্মপলাশলোচন প্রাপ্তির ঘোর প্রতিজ্ঞা—সেই-খানেই ভগবৎ-প্রেমের উন্মত্ততা। সেই প্রেম, সেই উন্মত্ততা, বহু সাধনার ফল। আজ যে, আমরা কৃষ্ণপ্রেমী, আজ যে, আমরা "বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা," বলিয়া প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত, আজ যে, আমরা "জয়জগদীশ হরে," বলিয়া পথে, পথে কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াই, ইহা কেবল আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের

ও আমাদের পূর্ব্ব দৈহিক কঠোর সাধনার ফল। ভারতসন্তান-গণের নারায়ণে একান্ত বিশ্বাস বহুকালাবধি স্থাপিত আছে। এক অপূর্ব্ব, অপরিমেয় মহাশক্তি হইতে যে, চরাচরাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, তৎসম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সহস্রযুগ পূর্ব্বে সহস্র সহস্র স্থলে এই পুণ্যক্ষেত্রে ভগবৎশক্তির কীর্ত্তন গীত হইয়াছে। সহস্রাধিক বর্ষ অতীত হইল, এই ভারতক্ষেত্রে ঋষিগণ একদিন সমস্বরে চক্ষুর, বাক্যের, ও মনের অগম্য সেই পরমপুরুষের শক্তি নিম্নলিখিত শ্লোকে গান করিয়া গিয়াছেন—

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই যে, জ্ঞান, ইহা যে, কতকালের সাধনার ফল, তাহা কল্পনায় আনা যায় না। আর্য্যসন্তানগণ একপ্রকার সংস্কারবশতঃ আস্তিক। যেমন কোন মানবকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে ঘাতকহস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য হস্ত উত্তোলন

সংস্কারবশতঃ হইয়া থাকে, সেইরূপ বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয় হইতে শেষরাত্রি পর্য্যন্ত হিন্দু ভারতসন্তান সংস্কারবশতঃ উপাসনা করিয়া থাকে। যুগে যুগে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু হিন্দুর এই আস্তিক্য-বুদ্ধির হ্রাস হয় নাই। এই ভারতক্ষেত্রে কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত ধর্ম্ম বিরোধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হিন্দু ভারতসন্তানের এই সাধনা-প্রবৃত্তির কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। সাধনা-প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধনার বাসনা বৃদ্ধি প্রয়োজন। কেবল প্রবৃত্তি থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। শাস্ত্রানুমোদিত নিত্য উপাসনার স্রোত বেগে বহা চাই, নতুবা ক্রমে ক্রমে স্রোত ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। সত্যবটে, সেই নিত্যশুদ্ধ সনাতন ব্রহ্মই সেই অচিন্তনীয় মহাশক্তি, সেই শৈবগণের শিব শক্তি, সেই বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুশক্তি, সেই শাক্তগণের কালীশক্তি, ত্রিভুবনে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত, অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্যমান পদার্থের অণু ও পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া অনুপ্রাণিত করিতেছে, সত্যবটে সেই অপূর্ব্ব শক্তি আমাদের দেহের প্রত্যেক শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে বিরাজ করিতেছেন, সত্যবটে, সেই মহাশক্তি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চৈতন্যের চেতন; কিন্তু তাহাতে কি হয়? আমাদের মন তাঁহাকে ধরিতে পারে কৈ? ধরিতে না পারাই ত গোলের কথা। তাইত আমরা এই সংসার-সমুদ্রে সময়ে সময়ে হাবুডুবু খাই তাইত আমরা বাক্‌বিতণ্ডাদ্বারা দিশাহারা হইয়া পড়ি, তাইত আমাদের অ অপর. নিন্দাস্তুতি, সুখদুঃখজ্ঞান, প্রবল হইয়া পড়ে। আর যদি আমরা মন ও প্রাণকে উপাসনাদি কার্য্যের দ্বারা ব্রহ্মশক্তিতে সমাহিত করি, তবেই ত আমাদের সেই

উন্মত্ততা আসিয়া পড়ে, যে উন্মত্তাবস্থায় ধ্রুব, হিংস্রজন্তু সমাকুল ঘোর অরণ্যে পদ্মপলাশলোচনের অন্বেষণে ধাবিত হন, সেই উন্মত্তাবস্থা আসিয়া পড়ে, যে অবস্থায় বৃন্দাবনের গোপীগণ বস্ত্রহীনা হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধা হয়; সেই উন্মত্তাবস্থা আসিয়া পড়ে, যে অবস্থায় প্রাতঃস্মরণীয় শাক্যসিংহ রাজভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পার্থিব যাবৎ বস্তু অলীকজ্ঞানে মুক্তি পাইবার অদ্ভুত কঠোর আয়োজন করেন; সেই উন্মত্তাবস্থা আসিয়া পড়ে, যাদৃশাবস্থায় বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গ, ধৃতমীনশরীর ধৃতরঘুপতিরূপ কেশবের, চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালীর প্রেমে বিভোর হইয়া, দেশে দেশে, পথে পথে, নৃত্য করিয়া মাধুর্য্যরসের স্রোত প্রবাহিত করেন। সত্য বটে, ব্রহ্ম নির্গুণ, কিন্তু এই ভারতক্ষেত্রে ঋষিগণ বহু আলোচনার পর নির্গুণ ব্রহ্মের দর্শন পাইবার সোপানস্বরূপ সাধকগণের হিতার্থে সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। এই যে রাশি, অয়ন ও নক্ষত্রঘটিত শারদীয় ও বাসন্তী দশভুজা মহিষাসুর মর্দ্দিনী দুর্গাদেবীর পূজা, এই যে দীপান্বিতায় শ্মশানবাসিনী দক্ষিণা কালিকার পূজা, এই যে সিংহস্কন্ধসমারূঢ়া জগদ্ধাত্রীরূপের আরাধনা, এই যে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী দেবীর পূজা, এই যে চৈত্রমাসে ভবদুঃখ হন্ত্রী অন্নপূর্ণার পূজা, এই যে অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র হইতে লতাবৃক্ষাদি পর্য্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সামগ্রীর পূজার আয়োজন, ইহা কেবল পরমব্রহ্মের শক্তির ও তাঁহার নানা উপাধির ভিন্ন ভিন্ন কালে আরাধনার সুব্যবস্থামাত্র। হিন্দু একে একে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সামগ্রীকে পূজা করিয়া আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিতে অভ্যাস করেন। আবার সকল পূজাতেই যোগসাধনার চেষ্টা। আসন

শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গকরাঙ্গন্যাস, প্রাণায়াম, ধ্যান প্রভৃতি উপাসনার কত শত একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থানুসারে যোগাসনে শক্তি ও শক্তির উপাধি পূজার যে, নানাবিধ ব্যবস্থা, ইহা কেবল আমাদের মনকে পরমব্রহ্মে লীন করিবার সুলভ বা দুর্গম উপায় মাত্র। দিবারাত্র, উত্তরায়ণে-দক্ষিণায়ণে, কৃষ্ণশুক্লপক্ষে যদি আমরা একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরচিন্তা করিতে অভ্যাস করিতে থাকি, তাহাহইলে সেই নিত্যশুদ্ধ পরমব্রহ্ম যে স্থানে যে ভাবে থাকুন না কেন, তাহা দুর্গামূর্ত্তিই হউক, কালী, জগদ্ধাত্রী, শিব, বিষ্ণু বা যে কোন মূর্ত্তিই হউক, তৎতৎ দেবদেবীর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সাধকের মুক্তিবিধান করেন। তবে অনন্যচেতা হওয়া প্রয়োজন, আর নিত্য আরাধনা আবশ্যক। এ আমাদের নিজের কথা নহে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্ত অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। আবার নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান এক জন্ম করিলে হইবে না। জন্মজন্মান্তরে এই কঠোর সাধনা চাই। একজন্মের অভ্যাস জন্মান্তরে স্ফূর্ত্তি পায় ও ঈশ্বরজ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ শত শত জন্ম অভ্যাস ও সাধনা করিলে জীব মুক্তিলাভ করে। সেইহেতু সংসারযাত্রা নির্ব্বাহকালে নারায়ণকে অনন্যচেতা হইয়া স্মরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নারায়ণের কেমন যে, মাহাত্ম্য তাঁহাকে স্মরণ করিলেই আর পাপকর্ম্মে মন যাইবে না। যখনই মন পাপের পন্থায় ছুটিবে, অমনি নারায়ণকে মনে করিলে রোগের উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ হইবে। এইরূপ অহর্নিশ সাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে; আর শাস্ত্রকে শিরোধার্য্য করিয়া রুচি ও সামর্থ্যানুসারে যথাযথকালে দুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতি বৈদিক ও তান্ত্রিকী পূজার

আয়োজন করিতে থাকিবে। অনায়াসে বা বহু পরিশ্রমে যাহা কিছু আহরণ করিবে, পরমাভক্তি সহকারে তাহা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া পরে সপরিবারে প্রসাদ গ্রহণ করিবে। যাহা কিছু পরিধান করিবে, তাহা প্রথমে তাঁহাকে উৎসর্গ করিবে। গৃহস্থাশ্রমে এই প্রকার আচরণ, এই প্রকার সাধনা করিতে করিতে সর্ব্বস্ব নারায়ণে অর্পণবুদ্ধি আসিবে; আর পূর্ব্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে, অন্তরীক্ষে, পাতালে, আপন বিগ্রহকে দেখিতে পাইবে—শুষ্ক জীবন উজ্জীবিত হইবে—ত্রিতাপতপ্ত তনু সুশীতল হইবে—সাধনবলে মুক্তির পথ সুগম হইবে।



তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

হিন্দুর পূজা।

——:০:——

ইতঃপূর্ব্বে, হিন্দুর সাধনা প্রসঙ্গে সাধনার অবশ্য কর্ত্তব্যতার ইঙ্গিত করিয়াছি। ক্ষেত্রভেদে সাধনা ব্যবস্থা। পিত্ত, বায়ু, শ্লেষ্মার, অল্পাধিক্য বিচারে যেমন রোগীর ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়, তদ্রূপ অধিকারি বিশেষে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সাধনার প্রকারভেদ স্বতঃসিদ্ধ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যেত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুংশ্রুতি পরায়ণাঃ॥

অর্থাৎ অধিকারিভেদে বা চিত্তের অবস্থাভেদে আত্মতত্ত্বদর্শনের বা মুক্তির চতুর্বিধ উপায়। ধ্যান বা ধ্যান পরিসংস্কৃত-চিত্তের দ্বারা পরমাত্মাকে স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে দর্শন উত্তম অধিকারির জন্য, সাঙ্খ্যযোগে বা প্রকৃতিপুরুষের বিবেক অনুশীলন দ্বারা অর্থাৎ দেহ মধ্যে যে কোন ক্রিয়া হইতেছে সমস্তই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধি,

প্রাণাদি জড়পদার্থের ক্রিয়া উহা আত্মার ক্রিয়া নহে এইজ্ঞানে চিত্তে আত্মদর্শন মধ্যম অধিকারির জন্য, যাবতীয় কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা রজঃ ও তমঃগুণ মন হইতে নিঃসারিত করিয়া, বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণ বিকাশ হইলে তদবস্থায় চৈতন্য দর্শন মন্দ অধিকারির জন্য ও কোন তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া আচার্য্যের উপদেশানুযায়ী উপাসনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে, সেইচিত্তে আত্মদর্শন মন্দতর অধিকারির জন্য ব্যবস্থা। শাস্ত্রান্তরেও ব্রহ্মভাব, ধ্যানভাব, জপভাব ও স্তবভাব উচ্চ অঙ্গের সাধকের জন্য, পূজাভাব নিকৃষ্ট সাধকের মুক্তিকল্পে উপদিষ্ট।

ধ্যানযোগ, সাঙ্খ্যযোগ, ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা ব্রহ্মভাব, ধ্যানভাব, জপভাব, ও স্তবভাব কীদৃশ, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও ঐ ঐ যোগের অনুষ্ঠান ও ভাবপ্রাপ্তি, একান্ত কঠিন। যে মহাপুরুষ ঐ ঐ যোগের অনুষ্ঠানে মত্ত বা ঐ ঐ ভাবপ্রাপ্তির প্রার্থী; তাঁহার দর্শন প্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পদরজঃ মস্তকে স্থাপন করিয়া মানবের জীবন সার্থক করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে রবি, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে শশী, দেবগণের মধ্যে বাসবকে, বা বিশ্বজগতের উৎকৃষ্টাদপি উৎকৃষ্ট পরম পুরুষকে মনে বাঁধা একান্ত দুরূহ। আমাদের মতন লোকের মন তাঁহাকে ধরিতে পারে না, আমাদের মতন লোক বাক্যেরদ্বারা তাঁহার রূপ বর্ণনা বা গুণকীর্ত্তন করিতে পারে না। সেই অচিন্ত্য, অব্যক্তপুরুষের জন্মকর্ম্ম নিশ্চয়ই দিব্য, একবার সেই জন্মকর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে যে এই আধিব্যাধিক্লিষ্ট দেহভার বহন

করিতে হইবে না তাহাও নিশ্চয়। এই প্রকৃতি সম্ভূত দেহের ও মনের সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজমান, তথাপি সেই পরম পুরুষকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, তাহার কারণ আমরা মনকেও দেহকে মন্থন করিতে অক্ষম। দধি, দুগ্ধে, ননী থাকিলেও বিনা মন্থনে ননী বাহির হয় না। এই মন্থন কার্য্যই-যোগ। দেহ ও মনকে অবিরত মন্থন করিতে পারিলেই, দেহও মন হইতে সুধা ক্ষরণ হয়, ভবদুঃখ দূরে যায়, বিশ্বজগতের দুর্ভেদ্য রহস্য বুঝিতে পারা যায়, সুখদুঃখ, নিন্দাস্তুতি, সমজ্ঞান হয়, সাধকের হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হয়, সোঽহং অবস্থা প্রাপ্তি হয়। বড় কঠিন কথা। ননী খেতে মন চায়, পায় কৈ? ভবদুঃখে জর্জরিত হইয়া মনে আকাঙ্ক্ষা হয়, যে যোগাসনে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উপবেশন পূর্ব্বক আত্মদর্শন করিয়া ছিলেন, মণিমুক্তাশোভিত আসমুদ্র ক্ষিতি পালের সিংহাসন অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ সেই আসনে নিমেষের জন্য বসিয়া ব্রহ্মচর্য্যাত্মক বেদান্তবোধ যাহার তপস্যা, সেই ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা করি। আকাঙ্খা হইলে কি হইবে? পারি কৈ? সে মনের বল কৈ? সে ত্যাগ কৈ? সে ভক্তি কৈ? জন্মদাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তন্ত্রমন্ত্রে মূর্ত্তিমান সে গুরু কোথায়? সে উপাসনা শিখাইবার, ভূতশুদ্ধি, আসন-শুদ্ধি করাইয়া পূজা শিখাইবার উপদেষ্টা কোথায়? হায় রে! কোথায় ব্রহ্মভাব, ধ্যানভাব, স্তবভাব আর কোথায় পুত্র পৌত্রাদিতে পরিবেষ্টিত সংসার ক্লেশদগ্ধ হতভাগ্য আমাদের মনের ভাব? অহরহঃ অন্নচিন্তা, অহরহঃ অর্থচিন্তা। ভ্রম দৃষ্টিতে এই সংসার-ক্ষেত্রে খেলাঘর পাতিয়া উন্মত্ত হইয়া আছি। শাস্ত্রে যাহাদের মন্দতর

অধিকারি বলিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই মন্দতর অধিকারিগণের অপেক্ষাও সহস্র গুণে নিকৃষ্ট। তথাপি শাস্ত্রবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গুরু সাহায্যে উপাসনা বা সগুণরূপের পূজাই আমাদের আত্মজ্ঞানলাভের কেবল মাত্র সোপান। সগুণরূপের উপাসনা করিতে করিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের পূজা করিতে করিতে আমাদের হৃদয়ে সেই অচিন্ত্য বস্তুকে চিন্তা সাম্রাজ্যের মধ্যে আনিবার পথ উদ্‌ঘাটন হইবে, চিরকালের জন্য ভব দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকিবে না, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' জ্ঞান হইবে।

পূজা দ্বিবিধ। নিত্য ও নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক পূজায় সংকল্প করিতে হয়। নিত্য পূজায় সংকল্পের প্রয়োজন হয় না। সন্ধ্যাবন্দনাদি, ইষ্টকুল দেবতার পূজা। ঐ ঐ পূজা সংকল্প রহিত ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিত্য চেষ্টা। আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি শক্তিপূজা নৈমিত্তিক পূজা। কালে কালে, তিথি নক্ষত্র বিচারে, কোন বিশেষ ফললাভাকাঙ্ক্ষায় ঐ ঐ পূজার আয়োজন হইয়া থাকে। সাবিত্রী আদি ব্রত পূজাও নৈমিত্তিক পূজা।

ধর্ম্ম সংস্থাপন মহাশক্তির নিত্যকর্ম্ম। তথাপি কালে কালে সাধকের প্রার্থনা পূরণচ্ছলে ঐ শক্তির বিশেষরূপে বিকাশ হয়। পুরাকালে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয় দেবগণকে অযথা স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলে, তাহারা রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বভূতের চৈতন্যরূপী মহামায়ার স্মরণাপন্ন হইলে দেবী শুম্ভ নিশুম্ভের সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনঃ সংস্থাপন করেন। আবার চৈত্র বংশ সম্ভূত রাজা সুরথ

অধিকারি বলিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই মন্দতর অধিকারি-গণের অপেক্ষাও সহস্র গুণে নিকৃষ্ট। তথাপি শাস্ত্রবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গুরু সাহায্যে উপাসনা বা সগুণরূপের পূজাই আমাদের আত্মজ্ঞানলাভের কেবল মাত্র সোপান। সগুণরূপের উপাসনা করিতে করিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের পূজা করিতে করিতে আমাদের হৃদয়ে সেই অচিন্ত্য বস্তুকে চিন্তা সাম্রাজ্যের মধ্যে আনিবার পথ উদ্‌ঘাটন হইবে, চির-কালের জন্য ভব দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকিবে না, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' জ্ঞান হইবে।

পূজা দ্বিবিধ। নিত্য ও নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক পূজায় সংকল্প করিতে হয়। নিত্য পূজায় সংকল্পের প্রয়োজন হয় না। সন্ধ্যাবন্দনাদি, ইষ্টকুল দেবতার পূজা। ঐ ঐ পূজা সংকল্প রহিত ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিত্য চেষ্টা। আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি শক্তিপূজা নৈমিত্তিক পূজা। কালে কালে, তিথি নক্ষত্র বিচারে, কোন বিশেষ ফললাভাকাঙ্ক্ষায় ঐ ঐ পূজার আয়োজন হইয়া থাকে। সাবিত্রী আদি ব্রত পূজাও নৈমিত্তিক পূজা।

ধর্ম্ম সংস্থাপন মহাশক্তির নিত্যকর্ম্ম। তথাপি কালে কালে সাধকের প্রার্থনা পূরণচ্ছলে ঐ শক্তির বিশেষরূপে বিকাশ হয়। পুরাকালে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয় দেবগণকে অবথা স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলে, তাহারা রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বভূতের চৈতন্যরূপী মহামায়ার স্মরণাপন্ন হইলে দেবী শুম্ভ নিশুম্ভের সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনঃ সংস্থাপন করেন। আবার চৈত্র বংশ সম্ভূত রাজা সুরথ

দানবগণ কর্তৃক রাজ্য অপহৃত হইলে সেই দেবীর বসন্তকালে আরাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় পৈতৃক রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন। তদবধি ভারতক্ষেত্রে বাসন্তী পূজার প্রবর্ত্তনা। বহু-দিন পরে লঙ্কাধিপতি ভক্ত চূড়ামণি রাবণ স্বীয় আসমুদ্র সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দেবীকে আরাধনা করিতেন, কিন্তু সেই রাবণের যখন জনক দুহিতা সীতা দেবীর অলোকসামান্য রূপ-রাশি দর্শনে পাপে মতি হয় তখনই রাবণ বংশের ধ্বংসের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের পূজায় পরিতৃপ্ত হইয়া অসময়ে শরৎকালে জাগ্রত হন ও ধর্ম্মসংস্থাপন করেন। আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যো-ধনের সমরোদ্যত ভীষণ সৈন্য সামন্তগণ দর্শনে অর্জ্জুন জয়লাভে বা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে নিরাশ হইলে, বাসুদেবের উপদেশানুসারে বরবর্ণিনী কাত্যায়নীকে পূজা করিয়া মহাযুদ্ধে জয় লাভ করেন, তদবধি দেবীর শারদীয় পূজার প্রবর্ত্তনা। সুতরাং এবম্বিধ পূজাই নৈমিত্তিক পূজা। আর ভারতের আর একযুগে মদ্রাধিপতি রাজা অশ্বপতি অনপত্যতা নিবন্ধন ব্রহ্মচর্য্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি তীব্র ব্রতাচরণ করিয়া সাবিত্রীর পূজা করেন। দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে এক মহা তেজস্বিনী উৎকৃষ্ট কন্যা দান করেন। অশ্বপতি ঐ কন্যার সাবিত্রী নাম রাখিয়া ছিলেন। যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঐ কন্যা মনে মনে অন্ধ-রাজা দ্যুমৎসেনের সত্যবান নামে ব্রহ্মপরায়ণ পুত্রকে পতিত্বে বরণ করেন, ও মহর্ষি নারদ মুখে সত্যবানের সম্বৎসরের মধ্যে অকাল মৃত্যুর সংবাদ অবগত হইয়াও সত্যবানকে ত্যাগ করেন নাই। নারদ কথিত পতির মৃত্যুকালের দিনত্রয় পূর্ব্বে

সাবিত্রী ত্রিরাত্র ব্রত করেন। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন রাত্রে রক্ত-বাসা, বদ্ধমৌলি, রক্তনয়ন যম স্বয়ং পাশ হস্তে সত্যবান পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, তপোনুষ্ঠান সম্পন্না পতিব্রতা সাবিত্রীকে আত্ম-পরিচয় দিয়া বলপূর্ব্বক সত্যবানের প্রাণ নিষ্কাশিত করিলে, সাবিত্রী ধর্ম্মরাজের ও সত্যবানের পশ্চাৎ অনুগমন করিতে করিতে অতি যুক্তি যুক্ত বাক্যে ধর্ম্মরাজকে সন্তুষ্ট করিয়া পাঁচটি বর লাভ করেন। তাহাতে শ্বশুরের রাজ্য, চক্ষু, পিতার ও স্বীয় শতপুত্রের ও সত্যবানের চারি শত বৎসর আয়ু লাভ করেন। তদবধি অস্মদ্দেশীয় কুলনারীগণ পতির আয়ু, পুত্র ও নানা সুখ প্রার্থিনী হইয়া কঠোর নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক ঐ ব্রতের আচ-রণ করেন। ইহাও নৈমিত্তিক পূজা।

সন্ধ্যা, ইষ্টমন্ত্রজপ, নারায়ণ পূজা, শিবপূজা বা রাধাকৃষ্ণের পূজা নিত্যপূজা। অর্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস দ্বারা জড়চৈতন্য মিশ্রিত দেহের চৈতন্য-শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া মনস্থির পূর্ব্বক বিশ্বের আদি-পুরুষকে বা বিশ্ববীজকে বা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী দেবতাকে পূজা, শিবপূজা, বা নারায়ণ পূজা গৃহস্থের নিত্য বিহিত পূজা; আর আচমন মার্জ্জনান্তে প্রাণায়াম করিয়া ব্রাহ্মণীরূপে প্রত্যূষে, বৈষ্ণবীরূপে মধ্যাহ্নে ও রুদ্রাণীরূপে সায়াহ্নে প্রত্যহ গায়ত্রী দেবীকে আরাধনা বা পূজাকে সন্ধ্যা বলে। ব্রহ্ম ও গায়ত্রী এক। মাতা অপেক্ষাও গায়ত্রী পূজ্যা—মাতরমিবহিত্বা গুরুতরাং গায়ত্রীং। যাবতীয় দেবারাধনা এক গায়ত্রীর দ্বারা সম্পাদিত হয়। গৃহস্থ দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়

করেন আর গায়ত্রী দেবীর উপাসনা, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য্য সকল সম্প্রদায়ের উপাসকগণের জন্য বিহিত।

নিত্য পূজাই হউক আর নৈমিত্তিক পূজাই হউক আমরা অবস্থাভেদে পরম ব্রহ্মের একই শক্তির পূজা করি। পুরাণ উপপুরাণে যাঁহাকে নারায়ণ বিষ্ণু বা তাঁহাদের অবতার রামচন্দ্র বা বাসুদেব বলা হয়, তন্ত্রে তাঁহাকেই আদ্যাশক্তি কালী তারা বলা হয়। ভোগে ভবানীমূর্ত্তি, পুরুষকারে বিষ্ণুমূর্ত্তি, কোপে কালীমূর্ত্তি ও সমরে দুর্গা মূর্ত্তি পূজা শাস্ত্রবিহিত।

একৈবশক্তিঃ পরমেশ্বরস্য
ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগ কালে॥
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণু
কোপেষু কালী সমরেষু দুর্গা॥

নিত্য পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। তবে বিষয়াশক্ত চিত্ত হইয়া যদি আমরা নিত্য পূজা করিতে না পারি, নিতান্ত পক্ষে সংকল্প করিয়া সম্বৎসরেও একবার সেই মহাশক্তির পূজার আয়োজন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যাঁহার নিত্য যোগাসনে বসিবার মতিগতি আছে বা শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তিনি যেন নিত্য পূজা করেন। এই শস্যপূর্ণ রাঢ়ে বঙ্গে এমন দিন ছিল, যেদিনে প্রত্যেক গৃহস্থ শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা করিতেন, নানা ব্রতপূজা হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আর আমাদের সেদিন নাই, এখন আমরা পর্ণশালায় শ্রমোপার্জ্জিত সর্ব্বস্ব মা ভগবতীর পাদপদ্মে অর্পণ না করিয়া প্রকাণ্ড মনোরম্য হর্ম্ম্যে ইন্দ্রিয় বরুণকে বাঁধিয়া রাখিয়া মহা সুখানুভব করি। সত্য

ঘটে দেহ হইতে চৈতন্যের উদ্বোধন করিয়া শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা বা মদ্ররাজের ন্যায় ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ব্রতাচরণ করা কঠিন কথা বা অর্জ্জুনের ন্যায় বা শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় দুর্গাদেবীর উদ্বোধন বা আরাধনা বড় কঠিন কথা, কিন্তু আমাদের ভবরোগ উপশমের ত ঔষধ চাই। যদি বল ঔষধ সকল অত্যন্ত তিক্ত কষায় হেতু সেবন ক্লেশকর। ভাল, এক কর্ম্ম কর। তিক্ত কষায় ঔষধে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণেতা ব্যাসদেবের নির্ম্মিত মধু ভাণ্ড ঢালিয়া দিয়া সুমিষ্ট করিয়া লও, আর শ্রীরাধিকার মুখার বিন্দের মধুকরকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিরাজমান বৃন্দাবনভূমির ব্রজাঙ্গনাগণের মনোমোহনকারীকে, সেই পরমাপ্রকৃতির প্রেমের বন্ধু পুরুষশ্রেষ্ঠ দেবকীনন্দনকে একৈক ব্রহ্মজ্ঞানে সুখে নিত্য সেবা কর, স্বল্পশুল্কে সুমহান্ প্রমোদ পাইবে, ভবরোগ উপশমিত হইবে।



চতুর্থ উচ্ছ্বাস

ব্যাসদেব।

——০——

কর্ম্মফলে ও ভগবৎ কৃপায় কত শত অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ স্বপ্রণীত গ্রন্থে অসীম কল্পনা, মেধা, ও চিন্তা শক্তির পরিচয় দিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কালধর্ম্মে কত নদ নদী শুকাইয়া গিয়াছে, কত গিরিশিখর ভূমিসাৎ হইয়াছে, কত ইন্দ্রপ্রস্থ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু গৌতমের, কণাদের, জৈমিনীর কপিলের, পতঞ্জলির, ব্যাসদেবের কীর্ত্তিধ্বজা এখনও সসাগরা সদ্বীপে সমভাবে উড্ডীয়মান রহিয়াছে।

গৌতম ও কণাদ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে জন্ম প্রবৃত্তি দোষ উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, মহর্ষি জৈমিনী পূর্ব্ব মীমাংসায় কর্ম্মকাণ্ড বেদের বিরোধ ভঞ্জন ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় প্রকৃতি পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞান নির্দ্দেশ করিয়া, ভগবান পতঞ্জলি স্বপ্রণীত গ্রন্থে সাংখ্য নির্ব্বাচিত পদার্থ ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার

করিয়া জগতে ধন্য হইয়া গিয়াছেন, আর পরাশরতনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস একদিকে বেদান্ত দর্শনে বাক্য মনের অতীত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মই সর্ব্বত্র জীবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন অপরদিকে মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে ষোড়শ সহস্র গোপিনীর প্রেমের বন্ধু নীলকলেবর পীতবসন বনমালীর অদ্ভুত লীলা কীর্ত্তন করিয়া ভক্তবৃন্দকে কৃত কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। সকলেই অগাধ ধীশক্তি সম্পন্ন, সকলেই সরস্বতীর বরপুত্র, সকলেই জগতের পূজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রণেতা ব্যাসদেব বড়ই চতুর বড়ই প্রেমিক কবি। দুরূহ দর্শন শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণার্থে ব্রহ্মশক্তিকে নানাবেশে সাজাইয়া, তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ কীর্ত্তন করিয়া ভক্তি রসের স্রোতে জগতকে প্লাবিত করিবার শক্তি কেবলমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই রচিতগ্রন্থে পরিস্ফুটিত হয়। সাক্ষাৎ পাইলে জিজ্ঞাসা করিতাম দেব! কতকাল বীণাপাণির পূজা করিয়া এমন হৃদয়োন্মাদিনী কল্পনাশক্তি লাভ করিয়াছিলে? বসুদেব পুত্রকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে এমন রঙে চিত্র করিবার, এমন সাজে সাজাইবার শক্তি কত কঠোর তপস্যা করিয়া লাভ করিয়াছিলে? এমন করিয়া প্রাণস্পর্শিনী ভক্তিরসে জগত মাতাইবার বিদ্যা কত আরাধনা করিয়া অর্জ্জন করিয়াছিলে? জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি যোগ একত্র করিয়া এমন দুরূহ দর্শন শাস্ত্রকে মিষ্টরসে পাক করিবার গূঢ়তত্ত্ব তোমায় কোন্ সিদ্ধহস্ত মোদক শিখাইয়াছিল?

এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, এই যে সূর্য্য যথাস্থানে থাকিয়া অহরহঃ ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন, এই যে চন্দ্র স্বরাজ্য আলোকিত করিয়া জীব সকলকে স্নিগ্ধ করিতেছেন, এই যে গ্রহগণ প্রাণিবর্গের ভাগ্য সূচনা করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে তৎপর, এই যে নক্ষত্রগণ কত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কার্য্যের দ্বারা জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, ইঁহাদের প্রভু কে? কোন্ মহাশক্তির বলে বলীয়ান হইয়া ইঁহারা জগতের হিতসাধনে তৎপর? আর এই যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবগণ যাঁহাকে অন্তর্যামীরূপে চিন্তা করে, যিনি তাহাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন, যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগৎরূপে দেখা দিতেছেন, আর যিনি জন্ম মরণাদি সংসার হইতে যাহারা ভয় যুক্ত তাহাদের প্রার্থনীয়, তিনি কে? সেই মহাশক্তি নিরূপণ করাই ত সাধকের কর্ম্ম, যোগিগণের প্রার্থনা। সেই মহাশক্তিইত গায়ত্রীর ভর্গঃ, পতঞ্জলির ঈশ্বর, বেদান্তের ব্রহ্ম, কপিলের ও শঙ্করের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই প্রপঞ্চের আদি কারণ প্রকৃতিপুরুষ, আর শ্রীমদ্ভাগবতের "সুরস্ত্রিয়ঃ" সহিত আভিভূর্ত "পুরষপর" বা ষোড়শ সহস্র গোপী পরিবেষ্টিত প্রেমিক নটবর শ্রীকৃষ্ণ। পুরুষের সহিত প্রকৃতি মিলিত হইয়া যেমন বিন্দু, নাদ, অব্যক্ত রব, পঞ্চভূত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, স্বেদজ, উদ্ভিদ্, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া জগৎপূর্ণ করিয়া ভগবল্লীলা প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রকার "রাধামাধবো

দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেম্বা," অর্থাৎ ত্রিভুবনে মাধবের সহিত রাধিকা ও রাধিকার সহিত মাধব বিরাজ করিতেছেন, অথবা এই ত্রিভুবনের সর্ব্বত্রই রাধামাধব! রাধা মাধবের সহিত কদাচ স্বতন্ত্র নহে, পরন্তু একই পদার্থ। ব্রহ্মই জীবরূপে প্রকাশ্যমান। এই যে চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র স্বকেন্দ্রে বা একে অপরকে বেষ্টন করিতেছে আর এই যে অসংখ্য স্বেদজ, উদ্ভিদ্, অণ্ডজ, জরায়ুজ, জীবগণ আসিতেছে. যাইতেছে, রকম রকম সজ্জায় আপনাপন কর্ম্মফল লইয়া ঘুরিতেছে, এই যে যুগচতুষ্টয় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহাদেরও সেই গতি। ইহারা সকলেই রাসচক্রে ঘুরিতেছে, আর সেই রাসচক্রের মধ্যে "পুরুষপর" শ্রীকৃষ্ণ। এই ভারতক্ষেত্রে জীবের দুঃখ নিবারণের উপায় নিরাকরণ কল্পে নানা মুনির নানা মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে পরাশরতনয় "জীবোব্রহ্মৈবনাপরঃ" এই মত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেম। যেমন উপাধিভেদে একই দীপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে দেখায় অর্থাৎ একই চন্দ্রের আলোক জলে পতিত হইয়া বহু চন্দ্ররূপে দেখায়, তদ্রূপ ব্যাসদেবের বেদান্ত মতে একই ব্রহ্ম, ক্ষেত্রভেদে বহুরূপে প্রকাশমান হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্যজ্ঞানে বুঝিয়াছিলেন জীবের পক্ষে নির্লিপ্ত পুরুষকে কল্পনায় আনা অসাধ্য; স্বয়ম্ভুকে (absoluteকে) উপলব্ধি করা অসম্ভব; "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি"; সেই জন্য তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন জীবই ব্রহ্ম। এই যে স্ত্রীপুরুষ আমি তুমি, স্থুল দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের চক্ষে তাহা সমান। শ্রীকৃষ্ণ আর ষোড়শ সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য অসংখ্য

গোপী বা জীবসমূহ, দৃশ্য ও অদৃশ্যমান স্থূলসূক্ষ্ম পদার্থ, রেণু অণুরেণু, সমস্ত জড় জগৎ (material world) নিজ নিজ বস্তু ধর্ম্মসহ প্রাণের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া অবিরামে ঘুরিতেছে। নির্লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে কল্পনায় আনা জীবের অসম্ভব বুঝিয়া পরাশরতনয় লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন সঙ্গত জ্ঞান করিয়াছিলেন। সেই মহাতেজীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল পদার্থেরই অভ্যন্তরে বিরাজ করিয়া যে কত প্রকার বেশ ধারণ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যখন সূর্য্যদেব জগতে দেখা দেন নাই, তখনও তিনি কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত ছিলেন। তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন ক্লীবও নহেন, অথচ তিনিই স্ত্রীজাতি, পুরুষ ও ক্লীব জাতি। নিত্য সনাতন এক অদ্বিতীয় শক্তি। যখন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পয়োধিজলে আবৃত তখনও তিনি তাহাতে বা তদন্তর্গত মীনশরীরে বিদ্যমান ছিলেন। মানব শক্তির চরম বিকাশেও সেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উদ্দেশ্য, কার্য্যকলাপের ব্যাখ্যা বা বিশ্বসমস্যার ভেদ নিরূপণ সম্ভবপর হইবে না। "যৎস্বমায়য়া অবভাসতে তৎ বিশ্বং সৃজতঃ তব ঈহিতং কঃ সাধু বেদিতুং অর্হতি ?" বিশ্বরহস্যের ভেদ নিরূপণ দুরূহ বুঝিয়া ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য কলাপকে কৃষ্ণলীলা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। এ বিশ্বের রহস্যভেদ মহাযোগিগণেরও অসাধ্য। সাধকগণ স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পাখীর বুলির অর্থ নানা ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়। দুরূহ বলিয়া একেবারে নিরস্ত না হইয়া ব্যাসদেব প্রাণপ্রণে ভক্তিকে ভিত্তি করিয়া সাধকের মন মাতাইবার

জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। সেই অব্যক্ত অচিন্ত্য চৈতন্যশক্তির প্রকটিত মূর্ত্তিকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, নানা সাজে সাজাইয়া, জীবব্রহ্মবাদী ব্যাসদেব ভক্তগণের সমক্ষে একটি সুন্দর ছবি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বিশ্বনাথের সহিত বিশ্বের যুগল মিলন সুন্দর ছবি। যোড়শ সহস্র গোপী পরিবেষ্টিত মদনমোহনের রূপ অতি অপূর্ব্ব, বড়ই হৃদয়াকর্ষক। সেই আদর্শ পুরুষের জীবনী পাঠ করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারা যায়, ব্যাসদেবের সে উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় সফল হইয়াছিল। ভাদ্রমাস্যাসিতেপক্ষে অষ্টমী তিথিতে রোহিণী তারকা যুক্ত রজনীতে, দেবকী জঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই আদর্শ পুরুষ কখন প্রাণ ভয়ে যশোদা প্রতিপালিত হইয়া গোচারণ করিয়াছিলেন, কখন গোবর্দ্ধন ধারণ, কখন পুতনাবধ, কখন কালিয়দমন, কখন রাসলীলা, কখন জরাসন্ধ বধ, কখন কুরুক্ষেত্র সমরে সারথ্য ও সুদর্শন চক্র ধারণ করত অদ্ভুত যুদ্ধ, আবার কখন যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ রাজসূয়ে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক আহুত ব্রাহ্মণগণের পদ প্রক্ষালন। ভিন্ন ভিন্ন বেশে মহাশক্তির নানা প্রকার বিকাশ দেখাইয়াছেন। আচরিত সকল কর্ম্মেরই মহৎ উদ্দেশ্য—গর্ব্বিত নরপতিচ্ছলে সমাচ্ছন্ন পৃথিবীর ভার হরণ দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন, লোক শিক্ষা ও ভক্ত ও সাধুগণের দুঃখনাশ বা পরিত্রাণ। সেই চৈতন্যশক্তি অজন্মা হইলেও তাঁহার মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, জামদগ্ন্য, রাম, বুদ্ধ, কল্কি ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভাব, কর্ম্ম ও লীলা স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম। ব্যাসদেবের সেই চৈতন্যশক্তির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম সাধারণের বোধ-গম্য করিবার অভিপ্রায় তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণ জীবনীর সর্ব্বত্রই

পরিলক্ষিত হইবে !

ব্যাসদেবের মতে জীবই ব্রহ্ম। যদি জীবই ব্রহ্ম হয়, তবে তাহার সংসারে এত দুঃখ ভোগ কেন? সুখ দুঃখ, কাম ক্রোধ, রোগ শোক ইত্যাদি দেহ ও মন প্রভৃতির ধর্ম্ম, জীব (আত্মার) ধর্ম্ম নহে। তবে জীবের দেহ সংযোগ হেতু অজ্ঞানে আবৃত মোহে মোহিত হইয়া তাহার রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়। সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য দর্শনের সৃষ্টি। যে দুর্লভ জ্ঞান জীবের রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর করে, যে জ্ঞানোপার্জ্জন হইলে সংসারে সুখ দুঃখ থাকে না. সেই জ্ঞান লাভের উপায় ও প্রাপ্তি শ্রীকৃষ্ণ জীবনের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এই জ্ঞানোপার্জ্জন অতি কঠিন, পরমযোগীর কর্ম্ম। এই যোগসাধনা শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত, কুটুম্ব ও বন্ধু পার্থ লাভ করিয়াছিলেন ! অর্জ্জুন যেমন জ্ঞানী, তেমনি কর্ম্মী, তেমনি ভক্ত। একাধারে এত গুণ কদাচ পরিলক্ষিত হয়। পরম ভক্ত, পরম জ্ঞানী হইলেও অর্জ্জুন কর্ম্মবীর। এই কর্ম্ম বীরের কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। আর শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত গোপীগণ জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্ত হইলেও তাহারা ভক্ত প্রধানা। এই ভক্ত প্রধানাগণের কর্ম্মক্ষেত্র বৃন্দাবন ভূমি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, মুক্তি লাভের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা থাকিলেও ব্যাসদেব ভক্তিযোগকে অপেক্ষাকৃত শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির সহজ উপায় স্থির করিয়া স্বরচিত গ্রন্থে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অবতারণা করেন। গোপীগণের ন্যায় ভক্তগণের জগতে দৃষ্টান্ত নাই। শ্রেষ্ঠ ভক্ত না হইলে, তাহারা পতি, শ্বশ্রূ, মাতাপিতাদির দুর্জ্জয় স্নেহ বন্ধন শৃঙ্খল ছেদন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ

বিষয়ক চিত্তৈকাগ্রতা দেখাইয়া তাঁহার প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিতেন না, কৃষ্ণের বেণুগীতে মুগ্ধ হইয়া কেহ বা স্তন্যপায়ী শিশুকে ত্যাগ করিয়া, কেহ বা অর্দ্ধভুক্তাবস্থায়, কেহ বা অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় পুণ্যক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনের যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান হইত চরমসুখপ্রার্থী হইয়া দ্রুতপদনিক্ষেপে সেই স্থানে কদাচ ধাবিত হইতেন না। স্বার্থসিদ্ধি জগতের সাধারণ নিয়ম। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহকালে মানবগণ আপনাপন মঙ্গলের বা সুখেচ্ছা করিয়া থাকে, তবে মাতাপিতা অভজনাকারি বালককে বা অন্ধবধির পুত্রাদিকে যে ভজনা করিয়া থাকেন, তাহা কতক আত্মতৃপ্তিকল্পে, কতক কারুণিক হইয়া। নিষ্কাম উপকার, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অতি বিরল। ব্যাসদেবের মতে বৃন্দাবনের গোপাঙ্গনা দিগের কৃষ্ণপ্রেম যথার্থই নিষ্কাম। তাঁহাদের কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা রহিত। কোন প্রত্যুপকার প্রার্থিনী হইয়াও নহে, করুণা জন্যও নহে। দেবতাগণকে যে যেমন ভজনা করেন, দেবতারাও তাঁহাদিগকে তদ্রূপ ভজনা করেন, এই নিয়ম জগতে চিরপ্রসিদ্ধ ও একান্ত সত্য। শ্রীকৃষ্ণ দেবগুরু, তিনি গোপীগণের আত্মনিবেদনে বা পরাভক্তিতে পরম প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার দেব পরিমাণ আয়ুদ্বারাও তাঁহাদিগের অসাধারণ সাধুত্বের প্রত্যুপকার সাধনে অসমর্থ। যথার্থ ভক্তের নিকট ব্যাসদেবের শ্রীকৃষ্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। পার্থ ভক্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অসীম শক্তিতে বিশ্বরূপ দর্শন পর্য্যন্ত সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনের গোপীগণ বাল্যাবধি কৃষ্ণ ভক্ত। প্রথমে প্রথমে ভক্তির তারতম্য ছিল বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ

কর্ত্তৃক বস্ত্রহরণের পর হইতে তাঁহাদের অষ্টপাশ মোচন হয়, তৎপরেই তাঁহারা বিনা তর্কে বিনা সন্দেহে আপনাপন মনপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তিযোগে, সাধনা বলে তাঁহারা দয়া, মোহ, লজ্জা, কুল, শীল, বর্ণ, ত্যাগ করিয়াছিলেন ও কৃষ্ণবিরহে মৃতবৎজ্ঞান করিতেন। যেমন মরণে ভব যন্ত্রণা দূর করে তেমনি শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিতে তাঁহাদের ভব যন্ত্রণার সমাধি হইত। ব্যাস দেবকে স্মরণ করিয়া অস্মদ্দেশীয় কোন প্রসিদ্ধ আধুনিক কবি শ্রীমতী রাধার বিরহ যন্ত্রণার আভাস ব্যক্ত করিবার প্রয়াসে বলিয়াছিলেন "মরণরে তুঁহু মোর শ্যাম সমান"। মরণ যন্ত্রণা নাকি সহস্র সহস্র বৃশ্চিক দংশনের সমতুল্য? আর মরণ নাকি সেই দারুণ যন্ত্রণার ঔষধ? জানি না অনেক বার মরিয়াছি বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় কিছুই স্মরণ নাই। ব্যাসরচিত শ্রীমদ্ভাগবতকে মস্তকে রাখিয়া বলিতে পারি মরণ যন্ত্রণা কেন, কল্পনায় যত প্রকার যন্ত্রণা আনা যাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি সেই সকল যন্ত্রণার উপাদেয় ঔষধ। ফলতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেবের চিত্রাবলীর সর্ব্বাংশই পাণ্ডিত্যপূর্ণ, হৃদয়স্পর্শী উজ্জ্বল ও মধুর। সমুদ্র পরিমাণ মসি ও অক্ষয় লেখনী লইয়া বসিলেও সে পাণ্ডিত্যের, সে উজ্জ্বল মধুরতার পরিচয় দেওয়া যায় না। অস্মৎসদৃশ মূর্খের সে চেষ্টা বামনের প্রাংশুলভ্যে ফলের লোভে হস্ত উত্তোলনের ন্যায়। তবে পূর্ণব্রহ্ম, পদ্মনাভ, সমদর্শী, সর্ব্বকারণকারণ, শরণাগতবৎসল শ্রীগোবিন্দের, বাক্যের দ্বারা কীর্ত্তন, সংসার ধ্বংসের কারণ চির প্রসিদ্ধ, তাই এই গুণ গান।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

ওঁকার মন্ত্র।

প্রথমোচ্ছ্বাসে বিশ্বসমস্যা প্রবন্ধে যে শিশু নন্দদুলালের উল্লেখ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আর সে শিশু নহে। তাহার আর পিতার টিকি টানিতে বাসনা নাই। কর্ম্মশরীরী শিশু স্বচেষ্টায় অনেক উন্নতি করিয়াছে। সে ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়িতেছে। বিন্দুর ব্যাখ্যা করিতেছে "যদি কোন সামতলিক ক্ষেত্রে এক রেখার দ্বারা এরূপ সীমা বদ্ধ হয় যে তাহার অভ্যন্তরস্থ কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে সীমা পর্য্যন্ত যতগুলিন রেখা টানা যায়, তাহারা পরস্পর সমান হয় তবে ঐ ক্ষেত্রকে বৃত্ত বলে।" চেষ্টা বলে পিতারও কিঞ্চিৎ জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু অনন্ত সাগরতটে এখনও তিনি অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জ্ঞান ভিখারী জীব। নিত্য নির্ব্বিকার ঈশ্বরই হউন আর প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত পুরুষই হউন, এক অদ্বিতীয়, অজ্ঞেয়, মহাশক্তির যে কোন নাম আরোপ হউক না কেন, সেই মহাশক্তিই যে চরাচরাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভ্রান্ত নিয়মে চালাইতেছেন এ সিদ্ধান্ত এ অন্ধবিশ্বাস, তাঁহার নিরন্তর মানস ক্ষেত্রে জাগ্রত থাকে। কিন্তু যে অলক্ষিত বা বোধাতীত কারণে ও নিয়মে অভোগশরীরী

উদ্ভিদ্ পশু, ও দৈবজাতির আর কর্ম্ম শরীরী মানবের জন্মমরণ বা কর্ম্মস্রোত বহিতেছে বা এই বিশাল জড় জগৎ যে যে নিগূঢ় অভ্রান্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সহস্র সহস্র যুগ হইতে প্রতি-নিয়ত সমশক্তিতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না, বিশ্বসমস্যার মীমাংসা হয় না, তাঁহার চেষ্টারও সাফল্য হয় না। কেবল মাত্র দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বল মস্তিষ্ক দুর্ব্বলতর হইয়া পড়ে। নন্দদুলাল পিতাকে বলিল "বাবা, ইউক্লিড, বৃত্তের ব্যাখ্যা করিতে ভুল করেন নাই বটে, কিন্তু আমি বৃত্তের একটি নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছি।" পিতা বলিলেন "তুমি আবার বৃত্তের নূতন ব্যাখ্যা কি করিয়াছি?" নন্দদুলাল উত্তর করিল "কেন বাবা, একটি বিন্দুর সকল দিকে সমান পরিমাণে বিস্তারই বৃত্ত, এ ব্যাখ্যা কি মন্দ হয়? বিন্দু আর বৃত্ত প্রায় একই পদার্থ, প্রভেদ এই, যে অগ্রে বিন্দুর উৎপত্তি, পরে বৃত্তের সৃষ্টি। বাবা! ভাবিয়া দেখুন আমার বৃত্তের ব্যাখ্যায় সঙ্কীর্ণ ও অসীম উভয় ভাবই বিদ্যমান, কিন্তু ইউক্লিডের বৃত্তের ব্যাখ্যায় অসীম ভাব আসে না, অসীম ভাব আমার ভাল লাগে।"

পিতা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলেন নন্দদুলালকৃত বৃত্তের ব্যাখ্যা মন্দ নহে। পুত্রের ব্যাখ্যায় সঙ্কীর্ণ ও অসীম উভয় ভাবই জড়িত। বড় বিন্দুত বৃত্তই বটে। আবার বৃত্তের সঙ্কুচিতাবস্থাইত বিন্দু। পিতা ভাবেন, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইহাও ত বিন্দুর অসীম বিস্তার। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি এককালে বিন্দুর আকারে পরিণত হইতে পারে? যোগ-পরায়ণ ঋষিগণ তপোবলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শব্দব্রাহ্মণ

এক আকারে বিন্দুরূপে জগতের পিতা, অপরাকারে নাদরূপে জগতের মাতা। বিন্দু ও নাদ চনকাকারে, শিবশক্তিরূপে, রাধা-কৃষ্ণমূর্ত্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য বিরাজিত। সেই বিন্দু, সেই শক্তি, সেই রাধাই কি অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইউক্লিডের• বিন্দু? জানি না ইউক্লিডের এ দার্শনিক ভাব অন্তরে ছিল কি না, কিন্তু ভারতের যুগযুগান্তরের গ্রন্থে লিখিত আছে নিরাকার মহাজ্যোতিঃ বিচিকীর্ষু হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বিন্দুরূপে আকার ধারণ করেন, আর ঐ বিন্দু হইতেই এই অদৃশ্যমান ও দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের চক্রাকারে বিস্তার। প্রথমে এই চক্র জলে আবৃত; জল বহ্নিতে আবৃত; বহ্নি বায়ু দ্বারা আবৃত; বায়ু আকাশে আবৃত; আকাশ অহঙ্কারে আবৃত; অহঙ্কার মহান্ দ্বারা আবৃত; মহান্ প্রকৃতিতে আবৃত; এইরূপ সপ্ত আবরণ এই চক্রের রক্ষনার্থ আছে। সুতরাং এক বিন্দুরূপ শম্ভুর শক্তি হইতে জগতের সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি। ব্রাহ্মণ তনয়ের বৃত্তের অসীম ভাব সূচক ব্যাখায় মহর্ষিগণ প্রণীত চক্রের ব্যাখ্যার আভাস পাইয়া পিতা পরম পুলকিত চিত্তে পুত্রকে বলিলেন, "তুমি যে বৃত্তের ব্যাখ্যা করিয়াছ তাহা আমার ভালই বোধ হইতেছে, তোমার বালক হৃদয়ে অসীম ভাব যে ভাল লাগে ইহা সুখের কথা।"

বিন্দু ও বৃত্ত পরস্পরের অবস্থান্তর বিশেষ হইলে মনে হয়, এই বিন্দু ও বৃত্ত একত্রিত করিয়াই কি ভারতের মহর্ষি-গণ পাশ্চাত্য পণ্ডিত নিউটনের ন্যায় ওঁকাররূপ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ও বিশ্বশক্তির মূর্ত্তি স্থির করিয়া গিয়াছেন? বৃত্তের, বিন্দু হইতে উৎপত্তি বলিয়াই কি বৃত্তের মধ্যে ও মস্তকে বিন্দু স্থাপনা করিয়া

ঋষিগণ ওঁকার মন্ত্রের সাধনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন? ওঁকার মন্ত্রের সাধনা কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, বিশ্বশক্তির বা বিশ্বরূপ সাধনা?

ওঁকার মহর্ষি কল্পিত অক্ষর। উহার দক্ষিণে সত্ত্বগুণ প্রকাশক সনাতন অকার, উত্তরে রজোগুণ প্রকাশক উকার, মধ্যে তমোগুণ প্রকাশক মকার, আর উর্দ্ধে নির্গুণ প্রকাশক নাদ ও বিন্দু অর্দ্ধমাত্রা রূপে বিরাজিত। সুতরাং ওঁকার যেমন ব্রহ্মের বা বিরাট পুরুষের রূপ প্রকাশক উহা তেমনি তাঁহার গুণ প্রকাশক। ঐ অক্ষর উচ্চারণ মাত্রেই মনের বা বাসনা পুঞ্জের সহিত প্রাণ বায়ুকে ষড়চক্র ভেদ পূর্ব্বক সুষম্না নাড়ী দ্বারা মস্তকে তুলিয়া দেয়, এই জন্য উহার নাম ওঁকার। এদিকে ওঁকার আত্মা শব্দের প্রতিবাক্য। আত্মার বর্ণনা করিতে হইলে ওঁকারের মাত্রাত্রয়ের বর্ণনা করিলেই হইল। অকার যেমন সকল বর্ণের আদি, তেমনি এক ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডের আদি, সেইজন্য ওঁকারের প্রথম মাত্রা অকার। অকার হইতে উকার উৎকৃষ্ট। উকার তেজের উৎকর্ষাবস্থা, সেইজন্য উকার বিষ্ণুর স্বরূপ ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা, আর সংহারকর্ত্তা রুদ্র স্বরূপ অকারের ও উকারের একীভাব মকার। উদাহরণচ্ছলে সেইজন্য এই পুণ্যক্ষেত্রের অজ্ঞাত জ্ঞাপক শাস্ত্রকারেরা অকার, উকার ও মকারের বৈশ্বানর, তৈজস, ও প্রজ্ঞা এই তিন স্বতন্ত্র নাম দিয়াছেন ও প্রাণিগণের [redacted] জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি স্থান বা অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মা অগ্রে পঞ্চময় জগৎ সৃষ্টি করিলেন, ক্রমে

বিষ্ণুরূপে তাহাই বিস্তার করিলেন, ক্রমে নিজ সৃষ্টিতেই লীন হইয়া শিবরূপে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলেন। এই অবস্থাত্রয় কি একই ব্রহ্মের অবস্থাত্রয় বা ওঁকার ভাব নহে? পক্ষান্তরে আমাদের দৈহিক যন্ত্র সমুহের ক্রিয়া মনঃ সংযোগে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, দেহাভ্যন্তরে সর্ব্বত্র অতি সূক্ষ্মরূপে একটি ক্রিয়া প্রতিনিয়ত হইতেছে। পিতৃমাতৃ দেহোৎপন্ন শুক্র শোণিতের মিশ্রণ কালে প্রাণিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবদেহ অবলম্বন সময়ে প্রথমে স্পন্দনের সূত্রপাত হয়। তাহাই ক্রমে বাণীতে পরিণত হয়। পরে অবস্থাভেদে ঐ বাণীই শব্দাকার ধারণ করে, ঐ শব্দই সর্ব্বপ্রথমে অকার রূপ ধারণ করে, ঐ শব্দই সর্ব্ববর্ণের আদি, ঐ শব্দ হইতেই সর্ব্ববাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে। অকার আর আকারে অতি সামান্য প্রভেদ। অকারের প্রথমে উৎপত্তি, পরে উকার ও শেষে মকার। সুতরাং ওঁকার বাকপ্রপঞ্চের একমাত্র আধার।

এদিকে দেখা যায় যখন দেহে বা দেহের সূক্ষ্মাবস্থা মনে, কিঞ্চিৎ তৃপ্তি ভাব আসে তখন যেন "আ" বা 'অ' ভাবের উদয় হয়, আর যখন দেহে বা মনে কষ্ট হয়, তখন যেন 'উ' ভাবের উদয় হয়। দারুণ জলপিপাসায় বা দারুণ ক্ষুধায় যখন কিঞ্চিৎ পানীয় বা অন্ন উদরস্থ হয় তখন দেহের সর্ব্বত্র যেন 'অ' বা 'আ' ভাবের উদয় হয়, আর শব্দরূপে ঐ ঐ অক্ষর মুখ হইতে নির্গত হয়; যাবৎ দেহযন্ত্রেও যেন ঐ শব্দ ধ্বনিত হইতে থাকে; আর যখন দারুণ কষ্ট হয় তখন "উ উ" শব্দ মুখেত বাহির হয়ই যেন দেহের লক্ষ লক্ষ শিরায় "উ উ" শব্দ ধ্বনিত হইতে থাকে। সসাগরা

সদ্বীপের অধীশ্বর হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত যাবৎজীবন "আ বা উ" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পুণ্যপাপ কর্ম্মফলানুসারে অল্লাধিক সুখদুঃখের মিশ্রণে এই লীলা ক্ষেত্রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সর্ব্বশেষে বাহ্যতেজ উপশান্ত হইলে, শরীরের ধাতুগত বোধ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে, দেহত্যাগ কালে দারুণ কষ্টের বা সুখের ক্ষণিক সাম্যভাব হয়। ব্রহ্মা ও মহাদেবের মিলন হয়, আর সেই দুর্দ্দিনে কৃপা সিন্ধু নারায়ণ কৃপা পরবশ হইয়া সমস্ত দেহ যন্ত্রে ক্ষণিক মধুর সাম্য ভাব আনিয়া দেন, অকার ও উকারের মকারের সহিত মিলন করাইয়া দেন। আদ্যের স্পন্দন, আদ্যের বাণী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে লীন হয়; ব্রহ্ম সাধনানুসারে, ওঁকারমন্ত্র সাধানানুসারে, ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত সহস্র কমলদল বিনির্গত সুধাধারা পানের মত্ততা লাভ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের একত্র মিলন অপূর্ব্বভাব, অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। ইহাই কি সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সাম্যাবস্থা বা অবিচ্ছেদে মিলিতাবস্থা? এই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীলের একত্র মিলন ভাব কি ওঁকার ভাব? সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্ত মহাশক্তির অব্যক্তাবস্থা? যাহাই হউক চারিদিকে অনন্ত চক্র. আর মস্তকে চন্দ্র বিন্দুর বিরাজমান ভাব চিন্তা করিলে মন ও প্রাণকে এক অনির্ব্বচনীয় রসে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। আবার মনে হয়, মানব. পশু পতঙ্গ, স্থলজ, জলজ. অণ্ডজ সকলেরই জড় বা অজ্ঞানাবস্থায় জন্ম পরে গর্ভকোষ হইতে নির্গত হইলে কর্ম্মে ঘোর প্রবৃত্তি ও শেষে দেহত্যাগ এই অবস্থাত্রয়ও ওঁকার ভাবের পাকভেদ, ওঁকার মূর্ত্তির একটী স্বতন্ত্র ছবি, নিতান্ত পক্ষে এক অনির্ব্বচনীয় নিত্য, সত্যভাব। সর্ব্বক্ষণে বিশ্বসংসারের ক্রিয়া

অহরহঃ নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়ে ওঁকার ভাবকে জাগাইয়া দেয়। আবার মনে হয় ওঁকারই শঙ্করগায়ত্রীর হরপার্ব্বতীর রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব, মনোহর প্রাণস্পর্শিনী যুগলমূর্ত্তি ; জন্ম-মরণের, প্রকৃতি পুরুষের জড়চৈতন্যের যুগল মিলন। কেবল জন্মও নহে, কেবল মরণও নহে, কেবল পুরুষও নহে. কেবল প্রকৃতিও নহে, কেবল চৈতন্যও নহে কেবল জড়ও নহে এক অব্যক্ত যুগল ভাব। বুঝিনা, বুঝিবার শক্তি নাই। তবে ইহা স্থির. যে প্রকারেই ওঁকার ভাবকে ভাবি না কেন, ওঁকার মন্ত্রকে চিন্তা করি না কেন, উহা এক অপূর্ব্ব, মনোহর, শান্তিপ্রদায়ক পবিত্রভাব। সেইজন্যই বোধ হয় বাসুদেব তাঁহার পরমাত্মীয় পরমভক্ত, পার্থকে কুরুক্ষেত্র সমরারম্ভে তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিত অপূর্ব্বাবস্থায়, চিত্ত শান্তির জন্য তাঁহার মঙ্গল কামনায় ও মুক্তি-দানের উদ্দেশে দেহত্যাগ কালীন ব্রহ্মের অভিধানভুত ওঁকার শব্দ বা মন্ত্র তন্ময়চিত্তে উচ্চারণের বা আরাধনার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই জানেন। এ দীন, এ অজ্ঞান. এ কীটানু-কীট কি বুঝিবে ? হে নারায়ণ ! হে রাসবিহারিন্ ! হে সুদর্শন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ ! তোমায় সহস্র সহস্র নমস্কার। এ দীনের তব পদ ভরসা। অন্তে এই পেষণী ক্ষেত্র হইতে মুক্তি পাইবার পূর্ব্বে যেন ঐ অনাধার ব্রহ্মে নির্ভর হয়। অপত্য কলত্রের মায়া কাটাইয়া শেষদিনে শেষক্ষণে যে আত্মার নিত্য হৃদয় কন্দরে বাস. সেই হৃদয় কন্দরে যেন তোমার ওঁকার রূপ জাগিয়া উঠে। দুর্ব্বল জিহ্বায় যেন ঐ শব্দ বাহির করিবার বল পাই। হে কৃপাসিন্ধু ! কৃপা করিয়া এখন হইতে সাধনার বল দাও।

তোমার কৃপাসিন্ধু নাম সার্থক করি। যে কর্ম্মের তুমিই একমাত্র কারণ, স্রষ্টা বা গুরু, সেই কর্ম্মের বর্ত্তমান দেহাবসানেই সমাপ্তি করাইয়া দাও। আর তোমার পাদপদ্মে করযোড়ে প্রতিনিয়ত এই ভিক্ষা যেন সেই অন্তিমকালে ওঁকার মহামন্ত্রের দর্শন লাভ হয়. প্রণব উচ্চারণের সার্থকতা হয়। আর যেন সেই মুহূর্ত্তে এই ক্ষুদ্র বিন্দুকে সজ্ঞানে থরথর হৃদয়ে অনন্ত ওঁকারে বিশ্বব্যাপী বৃত্তে চিরকালের জন্য মিশাইয়া দিতে পারি। তাহাই আমি পুরুষার্থ জ্ঞান করি, তাহাই আমার তীর্থ দর্শন, তাহাই আমার অমৃত, তাহাই আমার মুক্তি, তাহাই আমার সর্ব্বস্ব ! ওঁ কৃষ্ণ ওঁ কৃষ্ণ ! ওঁ কৃষ্ণ।

ওমিত্যে কাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতিত্যজন্ দেহং সযাতি পরমাং গতিং ॥

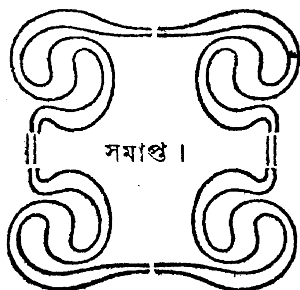




প্রার্থনা।

যদবধি জ্ঞানোদয়, হয়েছে আমার।
আকাশ পাতাল ভাবি, ভাবি এ সংসার॥
কার্য্যের কারণ ভাবি, ভাবি বিষ্ণু শিবে।
নারদে শ্রীকৃষ্ণে ভাবি, ভাবি সর্ব্বদেবে॥
কালী, তারা, দুর্গামায়ে, ভাবি পঞ্চভূতে।
বিহঙ্গে পতঙ্গে ভাবি, ভাবি রবিসুতে॥
কেন হয় কেন লয়, কোথা চলে যায়।
কোথা হতে আসে, পুনঃ এ বড় বিস্ময়॥
দুঃখের কারণ ভাবি, সুখের নিদান।
পতিব্রতা নারী ভাবি, প্রাণের সন্তান॥
স্নেহময়ী জননীরে, আত্মীয় স্বজনে।
দয়াময় জনকেরে, সদা ভাবি মনে॥
যারে যারে ভালবাসি, কেন ভালবাসি।
এখনি চলিয়া যাবে, তবু মিশামিশি?
বুঝিয়া বুঝিনে এতো, বড়ই বিস্ময়।
কে মোহে মোহিত করে, দেহ পরিচয়॥
সাঙ্খ্যের পুরুষ তুমি, অনাদি নিধন?
না তব প্রকৃতি সংজ্ঞা, বিশ্বের কারণ?
জৈমিনীর কর্ম্ম তুমি, উপাসনা ধ্যান?
অথবা ঈশ্বর তুমি, পতঞ্জলি জ্ঞান?

গায়ত্রীর ভর্গ তুমি বেদান্তের ব্রহ্ম ?
যোগিগণ যারে ভেবে, উপচয়ে ধর্ম্ম ?
কি তুমি বল না মোরে, করি অনুনয় ।
বাঁধা চোখ খুলে দাও, অন্তির্ম দশায় ॥
কেন সৃষ্টি কেন ভেদ, বুঝিতে না পারি ।
সাধনে পরাণ যায়, জনম ভিখারী ॥
যাহাই হও হে তুমি. প্রার্থনা আমার ।
চোখ বেঁধে ঘুরায়োনা, শত শত বার ॥
কৃপাসিন্ধু বিশ্বনাথ ! কৃপা করি মোরে ।
মুক্তি দাও পাদ পদ্মে, বেঁধে প্রেম ডোরে ॥



উচ্ছ্বাস পঞ্চক সম্বন্ধে কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির অভিমত :—

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি এল লিখিয়াছেন :—

আমি জ্ঞান বাবুর উচ্ছ্বাস পঞ্চক পাণ্ডুলিপির অবস্থায় পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। তাহা এক্ষণে মুদ্রাঙ্কিত নিরীক্ষণ করিয়া আরও আহ্লাদিত হইলাম। ইহা যথার্থই বিমল কোমল হিন্দু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। ইহাতে অনেক সনাতন বস্তু নবভাবে বিকশিত হইয়াছে। দুই এক স্থলে তন্ত্রের নিগূঢ় রহস্য স্পর্শ করা হইয়াছে। ভাব ও ভাষা সাধারণতঃ মধুর ও প্রাঞ্জল। আর্য্য হৃদয় পুরুষ পরম্পরা ক্রমে এই সুরে বাঁধা, অতএব উচ্ছ্বাস পঞ্চক কখনই অরণ্যে রোদন হইবে না।

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ ; সি, আই, ই, লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয়ের লেখা উচ্ছ্বাস পঞ্চক নামে বই খানি পড়িলাম। পাঁচটি উচ্ছ্বাসের সমষ্টির নাম উচ্ছ্বাস পঞ্চক। পাঁচটিই ভারতবাসীর উচ্ছ্বাস, হিন্দুর উচ্ছ্বাস, ব্রাহ্মণের উচ্ছ্বাস। প্রত্যেক উচ্ছ্বাসেই গভীর কথা, তত্ত্বের কথা, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কথা, ইহকাল পরকালের কথা, সংক্ষেপে পরিষ্কার ভাবে এবং গম্ভীর ভাবে লেখা হইয়াছে। ভাষাটি সরল ও প্রাঞ্জল। ভরসা করি, পাঠকের মনেও নানা উচ্ছ্বাসের উদয় হইবে।

(৩) মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিত লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসু বি, এ লিখিয়াছেন :—

আমি শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত উচ্ছ্বাস পঞ্চক পাঠ করিলাম। লেখক ভাবুক ও ভক্ত; ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন; সুতরাং সাহিত্যিক রূপে ঐ গ্রন্থের সমালোচনা সঙ্গত নহে। তবে এ কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বিশুদ্ধ, সরল রচনা রূপেও এ গ্রন্থ সমাদর লাভের যোগ্য। ওঁকার মন্ত্রে গ্রন্থকার যে নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি উপকৃত হইয়াছি; আশা করি অপরেও হইবেন। ইতি—